দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

আমরা প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। কৃষিকাজ একটি বৈজ্ঞানিক কাজ। এই কাজকে সহজ করার জন্য অনেক প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে। কৃষকেরা এখন এই প্রযুক্তিগুলো ফসলের মাঠে যেমন ব্যবহার করছেন তেমনি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধিতেও ব্যবহার করছেন। আবার গবাদিপশু ও হাঁস–মুরগি পালনে প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার করছেন, তেমনি মাছ চাষেও ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞানের গবেষণা যত এগুচ্ছে প্রযুক্তির উদ্ভাবনও ততই বাড়ছে।

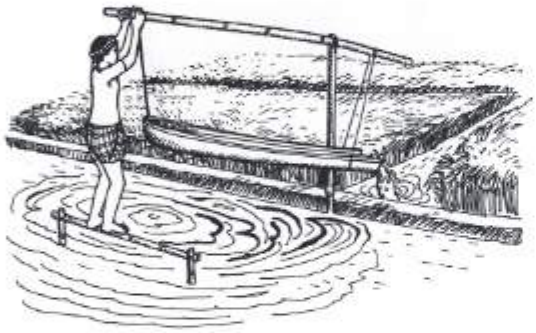

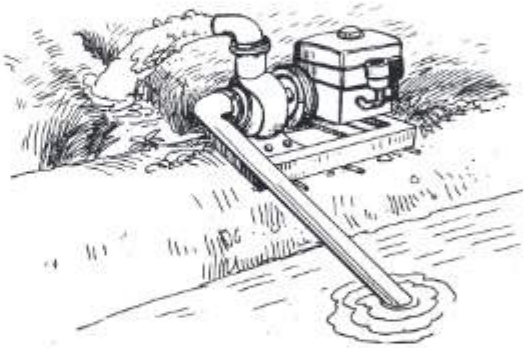

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- কৃষিতে ব্যবহৃত মাঠ প্রযুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে পারব।

কৃষিতে ব্যবহৃত মাঠ প্রযুক্তি

পাঠ– ১: পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি

সেচের প্রয়োজনীয়তা

আমরা জানি জমিতে পানির ঘাটতি হলে সেচ না দিলে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু এই সেচের পানিরও অপচয় হয়। সেচের পানির উৎস ভূনিম্নস্থ হোক অথবা ভূউপরিস্থ হোক, সবই কোনো না কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। এতে কৃষকের শ্রমের ব্যয় হয় এবং অর্থেরও ব্যয় হয়। তাই কোনোভাবেই সেচের পানির অপব্যয় বা অপচয় যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ সেচের পানির অপচয় রোধ করার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা যায়।

বিভিন্নভাবে সেচের পানির অপচয় হয়। কীভাবে সেচের পানির অপচয় হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। বাষ্পীভবন
২। পানির অনুস্রবণ
৩। পানি চুয়ানো

বাষ্পীভবন : সূর্যের তাপে প্রতিনিয়ত খাল–বিল, নদী–নালা থেকে যেমন পানি বাষ্পীভূত হচ্ছে তেমনি ফসলের জমির সেচের পানিও বাষ্পীভূত হচ্ছে। পানির এই বাষ্পীভবন রোধ করা কঠিন ব্যাপার। তবে সময়মতো এবং পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে যাতে ফসল নিজ প্রয়োজনে পানি গ্রহণ করতে পারে।

পানির অনুস্রবণ : সেচের পানি মাটির স্তর ভেদ করে সোজাসুজি নিচের দিকে চলে যাওয়াকে পানির অনুস্রবণ বলা হয়। অনুস্রবণের মাধ্যমে সেচের পানির অনেক অপচয় হয়। সেচের নালায় বা জমিতে শক্ত স্তর না থাকলে সহজেই পানির অনুস্রবণ ঘটে। অতএব, নালা বা জমিতে শক্ত স্তর সৃষ্টি করে পানির অনুস্রবণ রোধ করা যায়।

পানি চুয়ানো : পানি চুয়ানো পানির অনুস্রবণের অনুরূপ। শুধু পার্থক্য হলো অনুস্রবণের মাধ্যমে পানি নিচে চলে যায়। আর চুয়ানোর মাধ্যমে পানি অন্য ক্ষেতে চলে যায়। অনেক ইঁদুর আইলের এপাশ–ওপাশ গর্ত করে। ইঁদুরের গর্তের মাধ্যমেও পানি চুইয়ে অন্যত্র চলে যায়। অতএব, শক্ত মাটি দ্বারা এমনভাবে ক্ষেতের আইল ও নালা করতে হবে যেন পানি চুইয়ে না যায়। জমিতে ইঁদুর যাতে গর্ত করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে পারলে পানি চুয়ানো কমে যাবে।

সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

ফসলের প্রয়োজনের সময় সেচ দিলে সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রযুক্তিসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১। পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে।
২। সময়মতো পানি সেচ দিতে হবে।
৩। জমির চারদিকে ভালোভাবে আইল বেঁধে সেচ দিতে হবে।
৪। বিকেলে বা সন্ধ্যাবেলা পানি সেচ দিতে হবে।
৫। সারিবদ্ধ ফসলের ক্ষেতে দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে পানি সেচ দিতে হবে।
৬। মাটির বুনট বিবেচনা করে সেচ প্রদান করতে হবে।
৭। সেচ নালা ভালোভাবে মেরামত করে সেচ দিতে হবে
অথবা পাকা সেচ নালা তৈরি করতে হবে।
৮। উপযুক্ত পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে।
৯। সেচ নালা ফসলের দিকে ঢালু করে তৈরি করতে হবে।
১০। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে হবে।
১১। মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধান সেচ প্রকল্প : কৃষকের কৃষিকাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের সরকার অনেকগুলো সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যেসব এলাকায় সেচ প্রকল্প আছে সেসব এলাকার কৃষকেরা সারা বছর আউশ, আমন, বোরো, পাট, গম, আলু, শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদন করছেন। আবার শস্য বহুমুখীকরণ কৃষি পদ্ধতিও চালু করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। গঙ্গা–কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জি.কে.প্রজেক্ট)
২। বরিশাল সেচ প্রকল্প (বি.আই.পি)
৩। ভোলা সেচ প্রকল্প
৪। ঠাকুরগাঁও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প
৫। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প (সি.আই.পি)
৬। মুহুরী সেচ প্রকল্প (এম.আই.পি)
৭। পাবনা সেচ এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পি.আই.আর.ডি.পি)
৮। মেঘনা–ধনাগোদা সেচ প্রকল্প
৯। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (কে.আই.পি)

কাজ : তোমরা গ্রামের ফসলের মাঠ ঘুরে দেখ কীভাবে সেচের পানির অপচয় হচ্ছে। আর কৃষকেরা অপচয় রোধের জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এ বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন লিখে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : মাঠ প্রযুক্তি, বাষ্পীভবন, অনুস্রবণ

পাঠ– ২ : সেচ পদ্ধতি

বিভিন্নভাবে জমিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। কীভাবে পানি সেচ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে জমির মাটির প্রকার, ভূমির প্রকৃতি, পানির উৎস, ফসলের ধরন ইত্যাদির উপর। নিচে কয়েকটি সেচ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো–

১। প্লাবন সেচ ২। নালা সেচ ৩। বর্ডার সেচ
৪। বৃত্তাকার সেচ ৫। ফোয়ারা সেচ

প্লাবন সেচ : এই পদ্ধতিতে সমতল জমিতে খাল, বিল বা পুকুর হতে আসা পানি দিয়ে প্রধান নালার সাহায্যে সেচ দেওয়া হয়। সেচের পানি যাতে আশেপাশের জমিতে যেতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে আইল বাঁধতে হয়। এভাবে সেচ দিলে–

১। অল্প সময়ে অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায়।
২। জমির মধ্যে নালার দরকার হয় না।
৩। সমতল জমির জন্যে প্লাবন সেচ কার্যকর।
৪। শ্রম ও সময় উভয়ই কম লাগে।
৫। রোপা ফসল বা শস্য ছিটিয়ে বোনা জমিতে প্লাবন সেচ কার্যকর হয়।
৬। জমি যদি ঢালু হয় তবে আইল বেঁধে পানি আটকাতে হয়।

চিত্র- ২.১ : প্লাবন সেচ

নালা সেচ : নালা সেচ পদ্ধতিতে জমির ঢাল অনুযায়ী ভূমির বন্ধুরতা বা উঁচু নিচু সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নালা তৈরি করা হয়। অতঃপর প্রধান নালার সাথে জমির এ নালাগুলোর সংযোগ করে সেচ দেওয়া হয়। নালার গভীরতা ও দৈর্ঘ্য জমির উঁচু নিচুর উপর নির্ভর করে। জমি সমতল হলে নালার দৈর্ঘ্য বেশি হবে আর জমির ঢাল বেশি হলে দৈর্ঘ্য কম হবে।

চিত্র–২.২ : নালা সেচ

এভাবে সেচ দিলে–

১। সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় ও জলাবদ্ধতার ভয় থাকে না।

২। সমস্ত জমি সমানভাবে ভিজানো যায়।

৩। পানির অপচয় কম হয়।

৪। মাটির ক্ষয় কম হয়।

৫। একই পরিমাণ পানি দ্বারা প্লাবন অপেক্ষা অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায়।

বর্ডার সেচ : বর্ডার সেচ পদ্ধতিতে জমির ঢাল ও বন্ধুরতা অনুযায়ী ফসলের জমিকে কতগুলো খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রধান নালা থেকে জমির খণ্ডগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি খণ্ডে প্রধান নালা থেকে পানি প্রবেশের পথ আছে। একটি খণ্ডে পানি সেচ দেওয়া হলে এর প্রবেশপথ বন্ধ করে পরবর্তী খণ্ডে পানি সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ জমি থেকে ঢালের দিকে নালা কেটে পানি নিকাশ করা হয়।

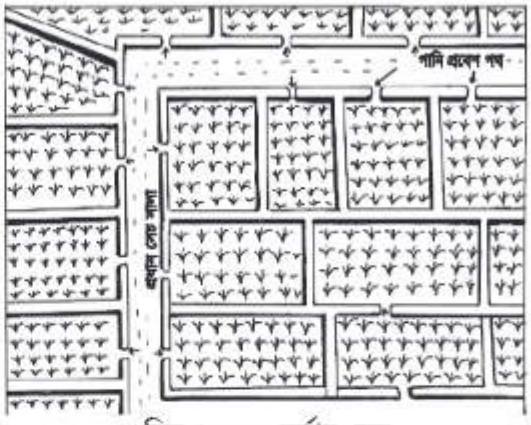

চিত্র-২.৩ : বর্ডার সেচ

এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে–

১। পানি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

২। পানির অপচয় হয় না।

৩। মাটির ক্ষয় কম হয়।

বৃত্তাকার সেচ : এই সেচ পদ্ধতিতে সমস্ত জমিতে সেচ না দিয়ে শুধু যে স্থানে গাছ রয়েছে সেখানেই পানি সরবরাহ করা হয়। সাধারণত বহুবর্ষজীবী ফলগাছের গোড়ায় এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। ফল বাগানের মাঝ বরাবর একটি প্রধান নালা কাটা হয়। অতঃপর প্রতি গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার নালা কাটা হয় এবং প্রধান নালার সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।

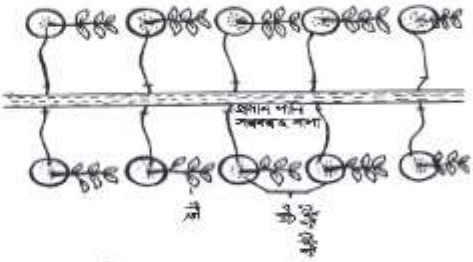
চিত্র-২.৪ : বৃত্তাকার সেচ

এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে–

১। পানির অপচয় হয় না।

২। পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

ফোয়ারা সেচ : ফসলের জমিতে বৃষ্টির মতো পানি সেচ দেওয়াকে ফোয়ারা সেচ বলে। শাক–সবজির ক্ষেতে এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বীজতলায় কিংবা চারা গাছে ঝাঁঝরি দিয়ে যে সেচ দেওয়া হয় তাও ফোয়ারা সেচ।

চিত্র-২.৫ : ফোয়ারা সেচ

কাজ : ফসল বা সবজির মাঠ পরিদর্শনে যাও এবং দেখ কীভাবে কৃষকেরা সেচ দিচ্ছেন। ব্যবহৃত সেচ পদ্ধতির উপর প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : সেচ, প্লাবন সেচ, নালা সেচ, বর্ডার সেচ, বৃত্তাকার সেচ

পাঠ– ৩ : পানি নিষ্কাশনের ধারণা ও উদ্দেশ্য

পরিমিত পানি সেচ যেমন ফসলের জন্য ভালো তেমনি অতিরিক্ত পানি ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করাকেই পানি নিষ্কাশন বা পানি নিকাশ বলে। ফসলের জমিতে জমে থাকা পানি অধিকাংশ ফসলের জন্য ক্ষতিকর। ধানের জমিতে পানি জমে থাকা উপকারী হলেও পেঁপে গাছ জমে থাকা পানি সহ্য করতে পারে না। ফসলের জমিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় ধরে গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছ মারা যায়। আবার পানি জমে থাকা ফসলের জমি থেকে পানি নিকাশ না করা পর্যন্ত সেখানে বীজ বপন করা যায় না, চারা রোপণ করা যায় না এবং গাছও লাগানো যায় না। সুতরাং পানির অভাব হলে গাছে পানি দিতে হবে। জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকলে কিংবা সেচের পানি বেশি হলে অতিরিক্ত পানি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।

অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর দিক : অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষেতে জমে থাকলে কী কী ক্ষতি হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো –

১. মাটিতে ফসলের শিকড় এলাকায় বায়ু চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শিকড় তথা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

২. দীর্ঘদিন পানি জমে থাকার ফলে মাটির বদ্ধ পরিসর পানি পূর্ণ হয়ে পড়ে এতে অক্সিজেন শূন্য হয়ে ফসলের শিকড় পঁচে গাছ মারা যায়।

৩. উপকারী অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের সংখ্যা ও সংক্রমণ বাড়ে।

৪. কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা কমে যায়।

পানি নিকাশের উদ্দেশ্য

পানি নিকাশের উদ্দেশ্য হলো–

১. মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়ানো।

২. গাছের মূলকে কার্যকরী করা।

৩. উপকারী অণুজীবের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৪. মাটির তাপমাত্রা সহনশীল মাত্রায় আনা।

৫. মাটিতে 'জো' আনা।

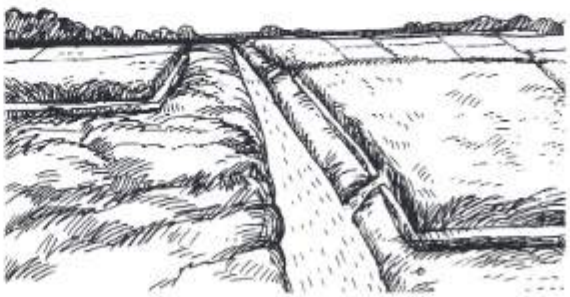

চিত্র-২.৬ নালা পদ্ধতি দ্বারা পানি নিষ্কাশন

পানি নিকাশের ব্যবস্থা

পানি নিকাশের জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যায়-

১. কাঁচা নিকাশ নালা তৈরি করা।

২. পাম্পের সাহায্যে নিকাশ করা।

৩. পাকা সেচ নালা তৈরি করা।

৪. অতিরিক্ত পানির উৎসমুখে বাঁধ দেওয়া।

৫. পানির গতি পরিবর্তন নালা তৈরি করা।

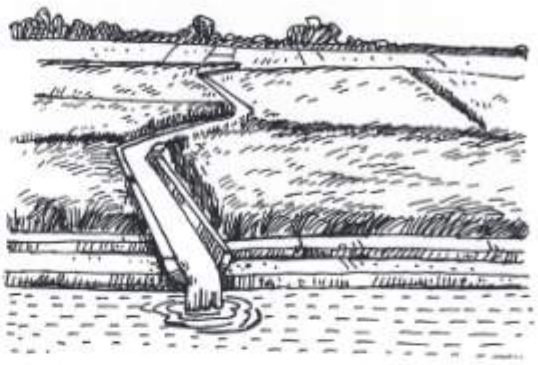

চিত্র–২.৭ : পাকা সেচ নালা দ্বারা পানি নিষ্কাশন

কাজ : পেঁপে বাগানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে দলগত আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : পানি নিষ্কাশন, মাটিতে 'জো' আনা, অণুজীব, শিকড় এলাকা

পাঠ–৪ : মাছের পুকুরের পানি শোধন

পুকুরে মাছ চাষ অতি পরিচিত কৃষি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির সফল ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন পুকুরের পরিবেশ মাছের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। পুকুরের পরিবেশ বলতে জলজ আগাছামুক্ত স্বাদু পানিবিশিষ্ট পুকুরকে বোঝায়। পুকুর থেকে মাছের ভালো উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের পরিবেশ তথা পানির গুণাগুণ রক্ষা করা খুবই জরুরি।

নানা কারণে পুকুরের পানি দূষিত হতে পারে। আর পানি দূষিত হলেই এতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং পানিতে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। রোগ–জীবাণুরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে মাছ মারা যায়, কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিবেশও দূষিত হয়। কাজেই মাছকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহের জন্য এবং বিষক্রিয়া ও অন্যান্য রোগ–জীবাণু থেকে বাঁচানোর জন্য পুকুরের পানি শোধন করা দরকার। নিচে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার কারণ ও শোধন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১। **দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব :** দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব পুকুরের একটি সাধারণ সমস্যা। সকালে বা বিকালে অথবা দিনের যেকোনো সময়ে, মেঘলা দিনে এবং কোনো কোনো সময় বৃষ্টির পর পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। এর সুস্পষ্ট লক্ষণ হলো অক্সিজেনের অভাবে মাছ পানির

উপর ভেসে খাবি খায় ও ক্লান্ত হয়ে পানির উপরিভাগে ঘোরাফেরা করে। অক্সিজেনের বেশি অভাব হলে মাছ মরতে শুরু করে। এসময় কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুকুরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে নিচে উল্লিখিত প্রযুক্তি গ্রহণ করে সুফল পাওয়া যায়।

ক) পুকুরে সাঁতার কেটে অক্সিজেনের অভাব দূর করা : পুকুরের পানি খুবই শান্ত থাকে। এক স্থানের পানি অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় না। ফলে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় না। এই অবস্থায় পুকুরে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করলে অক্সিজেনের অভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সাঁতার কাটার জন্য কিশোর–কিশোরীদের পুকুরে নামিয়ে দেওয়া যায়।

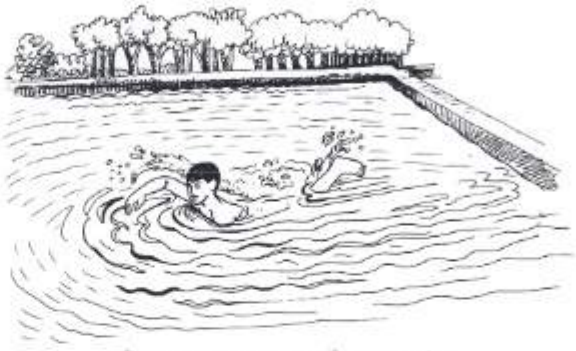

চিত্র-২.৮ : পুকুরে সাঁতার কাটা

খ) বাঁশ দ্বারা পুকুরের পানিতে আঘাত করা : বাঁশ দ্বারা পুকুরের শান্ত পানিতে আঘাত করলে পানিতে তোলপাড় হয় ও ঢেউ উৎপন্ন হয়। ফলে পানিতে বাতাসের অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় ও সমস্যা দূর হয়। ক্রমাগত বাঁশ দিয়ে আঘাত করে পুকুরের এক পাড় থেকে অন্য পাড় পর্যন্ত পৌঁছালে সুফল পাওয়া যায়।

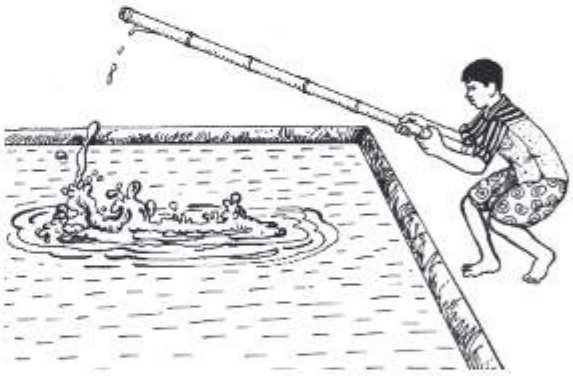

চিত্র-২.৯ : বাঁশ দ্বারা পুকুরের পানিতে আঘাত করা

২। **পুকুরের পানি ঘোলা হওয়া :** বিভিন্ন কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হয়। ক্ষুদ্র মাটির কণা পুকুরের পানি ঘোলা করে। আবার পুকুরের পাড় ধুয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করেও পানি ঘোলা হয়। ক্রমাগত কয়েকদিন বৃষ্টি হলে চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির পানি পুকুরে প্রবেশ করে এবং পানি অধিক ঘোলা হয়। পুকুরের ঘোলা পানি শোধনের জন্য নিচের প্রযুক্তি গ্রহণ করা যায়–

ক) শতক প্রতি ১–২ কেজি চুন প্রয়োগ করে ঘোলা পানি থিতিয়ে স্বাভাবিক করা যায়।

খ) শতক প্রতি পুকুরের পানির ৩০ সেমি গভীরতার জন্য ২৪০ গ্রাম ফিটকিরি প্রয়োগ করে ঘোলা পানি থিতানো যায়।

গ) সবচেয়ে সহজ প্রযুক্তি হলো শতক প্রতি ১২ কেজি খড় পুকুরের পানিতে রাখা।

৩। **পুকুরের পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব :** পুকুরের পানির পি এইচ মান নির্ণয় করে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রা বোঝা যায়। পি এইচ মিটারের সাহায্যে এটি নির্ণয় করা হয়। পি এইচ মান ৭ এর কম হলে পানি অম্লীয় হয় এবং এর বেশি হলে ক্ষারীয় হয়। পুকুরের পানিতে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ৬.৫ থেকে ৮.৫। অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব গ্রহণযোগ্য মাত্রার কম-বেশি হলে মাছ চাষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন কম হলে মাছের ফুলকায় পচন ধরে আর বেশি হলে মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায় এবং মাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। পুকুরের পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব স্বাভাবিক মাত্রায় আনার জন্য নিচের পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা যায়।

ক) **চুন প্রয়োগ :** অম্লত্ব বেড়ে গেলে শতক প্রতি ১–২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

খ) **তেঁতুল বা সাজনা গাছের ডাল ব্যবহার :** ক্ষারত্বের মাত্রা বেড়ে গেলে পুকুরের পানিতে ৩–৪ দিন তেঁতুল বা সাজনা গাছের ডাল ভিজিয়ে রাখা যায়।

৪। **পানির উপর সবুজ শেওলার স্তর :** পুকুরের পানিতে সবুজ শেওলার স্তর পড়েও পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়। এতে পানির রং ঘন সবুজ হয়। ফলে মাছের স্বাভাবিক চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটে। শেওলা পচে পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। অতঃপর মাছ পানির উপরিভাগে খাবি খায়। পানির এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক) **তুঁতে বা কপার সালফেট প্রয়োগ :** শতক প্রতি ১২–১৫ গ্রাম তুঁতে বা কপার সালফেট প্রয়োগ করা।

খ) **চুন প্রয়োগ :** শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায়।

কাজ : গ্রামের পুকুরগুলো ঘুরে দেখ। আর দেখ কীভাবে পুকুরের পানি দূষিত হচ্ছে। দূষিত পুকুরের মাছগুলো বাঁচাবার জন্য কৃষকেরা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা দেখ এবং লেখ।

নতুন শব্দ : অক্সিজেন, পানি শোধন, ঘোলা পানি থিতানো, ফিটকিরি

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত কৃষি প্রযুক্তি

পাঠ-৫ : বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে প্রথম যে প্রযুক্তির কথা বলতে হয় তা হচ্ছে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান শাকসবজি, গম, সরিষা, আলু ইত্যাদি ফসলের অনেক উন্নত এবং উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করেছে। শাকসবজির মধ্যে টমেটো, বেগুন, লাউ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ এসবের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব উন্নত জাতের সবজির বীজ কৃষকেরা পাচ্ছেন এবং ব্যবহার করছেন। গ্রীষ্মকালেও

টমেটোর চাষ করতে পারছেন। বারমাসব্যাপী বেগুন ও লাউয়ের চাষ করছেন। আরও কতো কী। এর ফলে কৃষকেরা ভালো আয় করছেন।

বাংলাদেশে ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ৭৮টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর সাথে আরও ধানের জাত যুক্ত করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। উচ্চফলনশীল ধানের জাতের অবদান হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশ এখন প্রায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিচে কয়েকটি ধানের জাতের নাম উল্লেখ করা হলো।

আউশ : বি আর ৯ (সুফলা), বি আর ১৪ (গাজী), বি আর ১৬ (শাহী বালাম) ইত্যাদি।

আমন : বি আর ১১ (মুক্তা), ব্রি ধান ৩০, ব্রি ধান ৩৩, ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪৪ ইত্যাদি।

বোরো : ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ২৯, ব্রি ধান ৩৬, ব্রি হাইব্রিড-১, ব্রি ধান ৫০ (বাংলামতি) ইত্যাদি।

বীজ উৎপাদন একটি প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড। বীজ উৎপাদনের প্রথম কাজ হলো বীজের গুণাগুণ সংরক্ষণ করা। তাই কৃষিবিজ্ঞানীরা অবিরাম ফসলের জাতের বংশবৃদ্ধি ও গুণাগুণ সংরক্ষণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযোগ করছেন। বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বলতে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে বোঝায়। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা নিচে উল্লিখিত শর্তসমূহ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

১। **বীজের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ** : বীজের পরিচিতি এর জন্মসূত্র থেকে। অতএব, বীজ উৎপাদনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন আকাঙ্ক্ষিত বীজের সাথে অন্য জাতের বীজের মিশ্রণ না ঘটে।

২। **বীজ ফসলের পৃথকীকরণ** : বীজ ফসলের জমিকে অবীজ ফসলের জমি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার নামই পৃথকীকরণ। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই বীজ ফসলের চারদিকে বর্ডার লাইন হিসেবে একই ফসলের অতিরিক্ত চাষ করতে হয়। এতে পর-পরাগায়নের সম্ভাবনা থাকে না।

৩। **বীজ শোধন** : বীজ জীবাণু বহন করতে পারে। সেজন্য জমিতে বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হয়। বীজ শোধন করার জন্য অনেক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। যেমন, গ্রানোসান-এম, ভিটাভেক্স-২০০ ইত্যাদি।

৪। **বীজ বপন পদ্ধতি** : বীজ সময়মতো বপন করতে হবে। আর বীজ বপনের সময় জমিতে যথেষ্ট রস থাকা প্রয়োজন। সাধারণত বীজ ফসল নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইনে বপন বা রোপণ করা ভালো। লাইনে বীজ বপনের জন্য বীজ বপনযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫। **রগিং :** বীজের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য রগিং একটি জরুরি কাজ। রগিং অর্থ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত বীজের গাছ ছাড়া আগাছাসহ অন্য যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ জমি থেকে শিকড়সহ তুলে ফেলা। ফুল আসার আগেই অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ রগিং করা ভালো।

৬। **আন্তঃ পরিচর্যা**

১. বীজের জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

২. যথাসময়ে কীটপতঙ্গ দমন করতে হবে।

৩. পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে।

৭। **বীজ ফসল কর্তন :** বীজ যখন পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ক হয় ও বৃষ্টিবাদলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না তখনই বীজ ফসল কর্তন করতে হয়। বীজ ফসল কাটার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মাড়াইঝাড়াই করতে হবে।

৮। **বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ :** বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে বীজে অতিরিক্ত আর্দ্রতা না থাকে। যেমন, ধানের বীজে শতকরা ১২ ভাগ আর্দ্রতা থাকতে পারে। ভালোভাবে শুকানোর পর বীজ সংরক্ষণের জন্য মাটি অথবা ধাতব পাত্রে রাখতে হবে। পাত্রটি অবশ্যই শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বীজে যাতে কীটপতঙ্গ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করা যেতে পারে।

মানসম্মত বীজের উৎপাদন

মানসম্মত বীজ তিন ধাপে উৎপাদন করা হয়।

যথা– ১) মৌল বীজ

২) ভিত্তি বীজ

৩) প্রত্যয়িত বীজ।

কৃষকের প্রত্যয়িত বীজ ছাড়া অন্য বীজ ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কেউ ফসল উৎপাদনে প্রত্যয়িত বীজ ছাড়া সারহীন বীজ ব্যবহার করেন তবে ফসল ভালো না হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই বিশেষজ্ঞরা প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করেন। নিচে বীজ উৎপাদনের ধাপগুলো আলোচনা করা হলো-

চিত্র–২.১০ : প্রত্যয়িত বীজ

মৌল বীজ : উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বংশগত গুণাগুণ সম্পন্ন যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে মৌল বীজ বলে। মৌল বীজ সাধারণত কম পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। এ বীজ বিক্রয়যোগ্য নয়।

ভিত্তি বীজ : বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের খামারে বীজ অনুমোদন সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মৌল বীজ থেকে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে ভিত্তি বীজ বলে।

প্রত্যয়িত বীজ : ভিত্তি বীজ থেকে বীজ অনুমোদন সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে প্রত্যয়িত বীজ বলে। এই বীজ কৃষকদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন সংস্থা অনুমোদন প্রদান করে। প্রত্যয়িত বীজ কৃষকদের নিকট বিক্রি করা হয়।

কাজ –১: কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চুক্তিবদ্ধ কৃষকের খামারে যাও আর দেখ তারা মানসম্মত বীজ উৎপাদনের শর্তগুলো মেনে বীজ উৎপাদন করছে কিনা।
কাজ– ২: তোমার কৃষি শিক্ষকের সাথে পরিকল্পনা করে সব শিক্ষার্থী মিলে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যাও আর দেখ মৌল বীজ কীভাবে উৎপাদন করছে।

নতুন শব্দ : বীজের বিশুদ্ধতা, পৃথকীকরণ, বীজ শোধন, রগিং, মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ, প্রত্যয়িত বীজ

পাঠ - ৬ : বীজ হতে চারা উৎপাদন

বীজ থেকে চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমত বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতকালীন সবজির জন্য আশ্বিন–কার্তিক মাসে আর গ্রীষ্মকালীন সবজির জন্য ফাল্গুন–চৈত্র মাসে বীজতলা তৈরি করতে হবে। আগাম ফসলের জন্য আরও একমাস আগে থেকে বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।

টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, পুঁইশাক, পেঁপে ইত্যাদির বীজ প্রথমে বীজতলায় ফেলে চারা উৎপাদন করতে হয়। চারার বয়স চার সপ্তাহ থেকে একমাস হলে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। বীজতলার আকার ৩ মিটার × ১ মিটার হলে ভালো হয়। এরূপ একটি বীজতলায় জাতভেদে ১০-১২ গ্রাম বীজ দরকার।

পানির উৎসের কাছে আলো বাতাস যুক্ত উঁচু উর্বর জমিতে বীজতলা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বীজতলা মূল জমি থেকে কমপক্ষে ১০ সেমি উঁচুতে থাকে। দুটি বীজতলার মাঝে ৩০ সেমি নালা রাখতে হবে। বীজতলার মাটির সাথে পচা গোবর ও ১০ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে দিতে হবে। অতঃপর সাবধানে

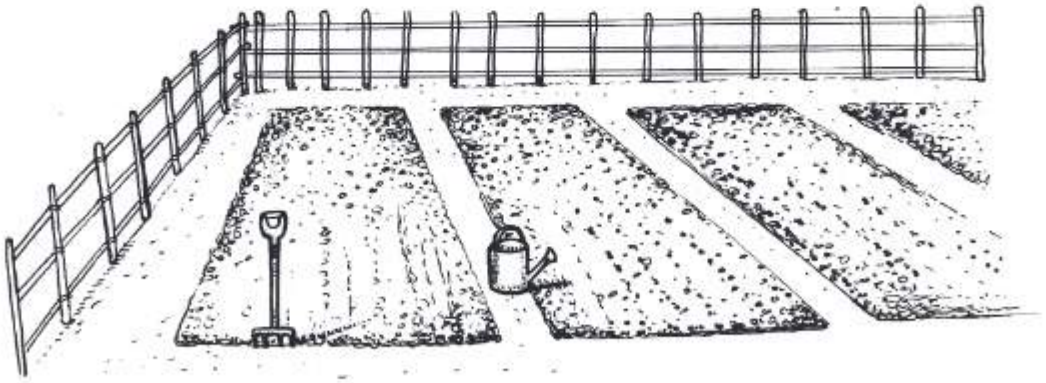

চিত্র-২.১১ : একটি আদর্শ বীজতলা

বীজ ছিটিয়ে ঝুরা মাটি দিয়ে বীজ তক্তার সাহায্যে উপরিভাগ সমান করে দিতে হবে এবং মাটি চেপে দিতে হবে। এরপর বীজতলায় প্রতিদিন নিয়মিত পানি দিতে হবে। বীজতলায় ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দেওয়া ভালো। কেননা এতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সমানভাবে পানি দেওয়া যায়। তিন চার দিনের মধ্যে চারা বের হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বীজতলা শুকিয়ে না যায়। যেসব বীজের ত্বক পুরু সেসব বীজের চারা বের হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। পুরু ত্বকের বীজ ২৪–৪৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বীজতলায় বুনলে তাড়াতাড়ি চারা বের হবে। রোদ ও বৃষ্টি থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

বয়স বাড়ার সাথে চারার তাপ সহ্য ক্ষমতাও বাড়ে। তবে মাটির আর্দ্রতা ঠিক রাখার জন্য ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে। বিকেল বেলা সেচ দেওয়া ভালো। অতঃপর মাটি যখন শক্ত হবে তখন নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

বীজতলায় পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণ করতে পারে। পোকা আক্রমণ করার আগেই কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সাধারণভাবে ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ ম্যালাথিয়ন–৫৭ ইসি গুলে বীজতলায় ছিটাতে হবে। আর কোনো চারা রোগাক্রান্ত হলে তা তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফুলকপি, বাঁধাকপি এসব সবজির চারা মূল জমিতে রোপণের পূর্বে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করা ভালো। চারা বড় হতে থাকলে ঝাঁঝরির পানিতে ১০ গ্রাম ইউরিয়া নিয়ে দ্রবণ তৈরি করে বীজতলায় ছিটালে চারা স্বাস্থ্যবান হয়। বীজতলায় আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য খড়কুটা বিছিয়ে দিতে হবে। চারার বয়স ৪–৫ সপ্তাহ হলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে।

চারা তোলার প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমত ঝাঁঝরির সাহায্যে সেচ দিয়ে বীজতলা ভিজিয়ে নিতে হবে। অতঃপর চারা তোলার জন্য খুরপি ও চারা বহনের ঝুড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। চারা তোলার উপযুক্ত সময় হচ্ছে বিকাল বেলা। চারা সাবধানে তুলতে হবে যাতে শিকড় ছিড়ে না যায়। চারা তোলা হলে ঠিকমতো পরিবহন করে তৈরি করা মূল জমিতে নিতে হবে। চারা রোপণের সময় খুরপির সাহায্যে গর্ত করে বীজতলায় যেভাবে চারা ছিল ঠিক সেভাবেই গর্তে রোপণ করতে হবে।

কাজ : তোমার বাড়ির পাশে ৩ মিটার ×১ মিটারের একটি জায়গা নির্বাচন কর।

১. বীজতলায় চারা উৎপাদন কর।
২. কোদাল দিয়ে নির্বাচিত স্থানের মাটি ঝুরঝুরা করে চাষ কর।
৩. বীজতলা মাটি থেকে কমপক্ষে ১০ সেমি উঁচুতে হতে হবে।
৪. পচা গোবরের সাথে ১০ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে বীজতলার উপর ছিটিয়ে দাও এবং মিশিয়ে দাও। মাটির ২ সেমি গভীরে বীজ বপন কর।
৫. প্রতিদিন বীজতলায় ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দাও। ৩–৪ দিনের মধ্যেই চারা বের হবে।
৬. যতদিন চারা মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত না হবে ততদিন এই পাঠের নির্দেশমতো বীজতলার যত্ন নাও।

নতুন শব্দ : চারা উৎপাদন, বীজতলা, ঝাঁঝরি, দ্বিতীয় বীজতলা, ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি, ছাউনি, পুরু ত্বকের বীজ

পাঠ-৭ : উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির অবদান অনেক। প্রযুক্তি প্রাচীন হোক কিংবা আধুনিক হোক, চালু প্রযুক্তির কোনোটির অবদানই অস্বীকার করা যায় না। নিচে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির অবদান তুলে ধরা হলো।

অঙ্গজ চারা উৎপাদন : প্রায় সব গাছই বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। তবে বীজ ছাড়াও গাছের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে চারা উৎপাদন এবং বংশবিস্তার করা সম্ভব। অঙ্গজ চারার ব্যবহার কৃষিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে এবং এ থেকে কৃষকেরা অনেক লাভবান হচ্ছেন। অঙ্গজ চারা উৎপাদন প্রযুক্তির মধ্যে কর্তন বা ছেদ কলম, দাবা কলম, গুটি কলম, জোড় কলম এবং চোখ কলম প্রধান। অঙ্গজ চারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ থেকে জন্মানো গাছে মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে। নিচে অঙ্গজ চারা উৎপাদনের কয়েকটি পদ্ধতি দেওয়া হলো। আর চারা গাছ থেকে তাড়াতাড়ি ফল পেতে হলে অঙ্গজ চারা উৎপাদন পদ্ধতির জুড়ি নেই।

১) **কর্তন বা ছেদ কলম** : এই পদ্ধতিতে শাখা, মূল, পাতা ইত্যাদি মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছায়াযুক্ত স্থানে টবে বা নার্সারির বেডে রোপণ করতে হয়। ১৫ দিনের মধ্যে তা থেকে নতুন চারা উৎপন্ন হয়। অতঃপর চারাটি অন্যত্র মূল জমিতে রোপণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার খুবই সহজ। গোলাপ, লেবু ইত্যাদি ফুল ও ফল গাছের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

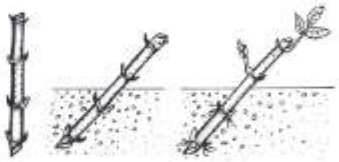

চিত্র-২.১২ : কর্তন বা ছেদ কলম

২) **দাবা কলম** : প্রথমে মাতৃগাছের মাটির নিকটে অবস্থিত শাখা নিচে নামিয়ে দুই গিঁটের মাঝখানের বাকল কাটতে হবে। বাকলের নিচের সবুজ অংশে ছুরির ভোতা পাশ দিয়ে চেছে ফেলতে হবে। অতঃপর কাটা অংশ মাটিতে চাপা দিতে হবে। কিছু দিন পর কাটা অংশ থেকে শিকড় গজাবে এবং নতুন চারা হবে। গজানো অংশ কেটে ২-৩ সপ্তাহ পর সাবধানে মাটিসহ উঠিয়ে অন্যত্র রোপণ করতে হয়। লেবু, পেয়ারা, গোলাপ, ইত্যাদি গাছে দাবা কলম করা হয়।

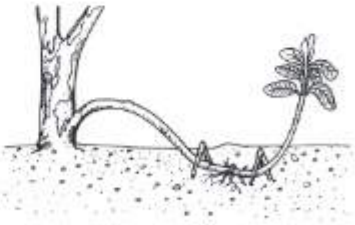

চিত্র-২.১৩ : দাবা কলম

৩) **জোড় কলম :** জোড় কলমের দুটি অংশ (১) রুট স্টক ও (২) সায়ন। অনুন্নত যে গাছের সঙ্গে জোড়া লাগানো হবে সে গাছটিকে রুট স্টক বলে। উন্নত জাতের গাছের যে অঙ্গ স্টকের সঙ্গে লাগানো হবে তাকে বলা হয় সায়ন। রুট স্টক ও সায়নের জোড়া লাগানো পদ্ধতিকে জোড় কলম বলে। জোড়কলম প্রধানত দু'ধরনের হয়। যেমন-যুক্ত জোড় কলম ও বিযুক্ত জোড় কলম। জোড় কলমের মাধ্যমে বর্তমানে আম, তেজপাতা, সফেদা প্রভৃতি গাছের বংশবিস্তার করা হচ্ছে।

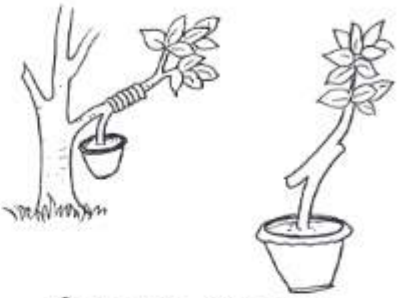

চিত্র–২.১৪ : জোড় কলম

কাজ : ১। গোলাপের একটি ডাল কেটে ছেদ কলম তৈরির মাধ্যমে চারা তৈরি কর।
২। গুটি কলম পদ্ধতিতে রঙ্গানের একটি চারা তৈরি করে টবে রোপণ কর।

নতুন শব্দ : সুফলা, গাজী, শাহী কলম, মুক্তা, বাংলামতি, কর্তন বা ছেদ, দাবা, গুটি, জোড় কলম

পাঠ-৮ : প্রাণীর বংশবৃদ্ধি প্রযুক্তি

প্রাণিসম্পদের মধ্যে হাঁস–মুরগি অন্যতম। সুতরাং এই পাঠে হাঁস–মুরগির বংশবৃদ্ধিতে ডিম ফোটানো ও প্রাকৃতিক উপায়ে বাচ্চা ফোটানোর প্রযুক্তির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। ডিম ফোটানোর জন্য প্রথমত উর্বর ডিম দরকার। ডিম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

১। মসৃণ, মোটা ও শক্ত খোসার ডিম
২। স্বাভাবিক রঙের ডিম
৩। মাঝারি আকারের ডিম
৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডিম
৫। ৫০–৬০ গ্রাম ওজনের ডিম
৬। ডিমের বয়স গ্রীষ্মকালে ৩–৪ দিন এবং শীতকালে ৭–১০ দিন

ডিম ফোটানো পদ্ধতি : ডিম ফোটানোর দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ও কৃত্রিম পদ্ধতি। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে হাঁস মুরগি দ্বারা ডিম ফোটানো হয়। গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। এতে অর্থের বিনিয়োগ লাগে না। অন্যদিকে তুষ পদ্ধতি বা ইনকিউবেটর পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে ডিম ফোটানোর মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি : মুরগির নিজের দেহের তাপ দিয়ে নিষিক্ত ডিম ফোটানোকে প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি আমরা নিজেদের বাড়িতে দেখে থাকব। দেশি মুরগি কিছুদিন ডিম পাড়ার পর কুচে হয় এবং ডিমে তা দিতে আগ্রহী হয়। এরূপ মুরগিকে ১০–১২টি ডিম দিয়ে বসানো হয়। প্রথমত মুরগির জন্য ঝুড়িতে খড়কুটা দিয়ে একটি বাসা বানাতে হবে। বাসাটি ঘরের নির্জন কোণে রাখতে হবে। মুরগির বাসা ৩৫ সেমি ব্যাস এবং ১০ সেমি গভীর হবে। ডিমে বসানোর পূর্বে মুরগিকে ভালোভাবে খাওয়াতে হবে। মুরগির সামনে দানাদার খাবার ও পানি রাখতে হবে। ৮–১০ দিন পর ডিমগুলো সূর্যের আলোয় পরীক্ষা করতে হবে। ডিমের ভিতরে ভ্রূণ থাকলে কালো দাগের মতো দেখাবে। ২১তম দিবসে ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। বাচ্চারা প্রায় দুইমাস মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। এরপর বাচ্চারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে।

চিত্র–২.১৫ : ডিম ফোটানোর প্রাকৃতিক পদ্ধতি

ইনকিউবেটর যন্ত্র দ্বারা ডিম ফোটানো পদ্ধতি : প্রাকৃতিক ও ইনকিউবেটর যন্ত্র দ্বারা ডিম ফোটাতে একই সময়ের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো একসাথে অনেক সংখ্যক ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর সময় রোগ নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ বাচ্চা উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে মুরগিগুলো ডিমে তা না দেওয়ার কারণে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতি খামারিদের নিকট খুব জনপ্রিয়।

ইনকিউবেটর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র । এতে শত থেকে লক্ষাধিক ডিম ফোটানো যায়।

ইনকিউবেটর যন্ত্র দ্বারা বাচ্চা ফোটানোর সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

১। **তাপমাত্রা:** ইনকিউবেটরের তাপমাত্রা ৯৯.৫–১০০.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উল্লেখ্য উপযুক্ত তাপমাত্রা না পেলে ভ্রূণের কোষ বিভাজন হবে না এবং ভ্রূণের মৃত্যু হবে।

২। **আর্দ্রতা:** ইনকিউবেটরের মধ্যে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ৬৫–৭০% এর মধ্যে রাখা হয়। ইনকিউবেটরে আর্দ্রতা কম থাকলে ডিম থেকে পানি বাষ্পায়িত হয়ে ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩। **বায়ুপ্রবাহ:** ভ্রূণের অক্সিজেন গ্রহণ এবং ডিম থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হওয়ার জন্য বায়ুপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ইনকিউবেটরে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে অক্সিজেনের প্রবেশ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকে। বায়ুপ্রবাহ না থাকলে ভ্রূণের মৃত্যু হয়।

৪। সেটিং ট্রেতে ডিম বসানো: সেটিং ট্রেতে ৫৫–৬০ গ্রাম ওজনের ডিম বসানো হয়। ডিমগুলোর মোটা অংশ উপরের দিকে এবং সরু অংশ নিচের দিকে থাকে। ইনকিউবেশন চলাকালীন সময়ে ডিমগুলো ৪৫ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে থাকে।

চিত্র–২.১৬: একটি ইনকিউবেটর যন্ত্র

৫। ডিম ঘুরানো: ডিমের সর্বদিকে সমানভাবে তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ পাওয়ার জন্য ডিমগুলোকে দৈনিক ৩–৮ বার ঘুরানো হয়ে থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৬। হ্যাচিং ট্রেতে ডিম স্থানান্তর : মুরগির ডিমের ক্ষেত্রে ১৮ দিন পর ডিমগুলোকে সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর করা হয়। হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে ২৫তম দিবসে সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর করা হয়। উল্লেখ্য সেটিং ট্রেতে বাচ্চা ফোটার কোনো সুযোগ নেই। হ্যাচিং ট্রেতে তাপমাত্রা ১–২ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমিয়ে দিতে হবে।

৭। ডিম ক্যান্ডলিং করা: আলো দ্বারা ডিমের ভিতরের অংশ পর্যবেক্ষণ করাকে ক্যান্ডলিং বলে। ডিম বসানোর সাত দিন পর অনুর্বর ডিম ও মৃত ভ্রুণসহ ডিম পৃথক করার জন্য সকল ডিমকে ক্যান্ডলিং করা হয়। আবার ১৪তম দিবসেও ক্যান্ডলিং করে একই রকমভাবে মৃত ভ্রুণসহ ডিম পৃথক করা হয়। ভ্রুণসহ মৃত ডিম, পচা ডিম পৃথক না করলে ইনকিউবেটরের মধ্যে সুস্থ ডিম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

৮। ফিউমিগেশন: এটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করার একটি পদ্ধতি। এই ক্ষেত্রে ১০০ ঘনফুট জায়গার জন্য ৭০ সিসি ফরমালিন ও ৩৫ গ্রাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা

হয়। এই মিশ্রণটি মাটির পাত্রে রেখে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক মিশ্রণটি অত্যন্ত বিষাক্ত ধোঁয়া উৎপাদনের মাধ্যমে রোগজীবাণু ধ্বংস করে। তাই ব্যবহারের সময় দরজা জানালা বন্ধ করে সকলকেই দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করা উচিত।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আশেপাশের কোনো মুরগির খামার পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

নতুন শব্দ : ইনকিউবেটর, সেটিং ট্রে, হ্যাচিং ট্রে, ক্যান্ডলিং, ফিউমিগেশন

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বীজতলায় ..... দিয়ে পানি দেওয়া ভালো।

২. পুরু ত্বকের বীজ..... ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে বীজতলায় বুনলে তাড়াতাড়ি চারা বের হবে।

৩. হ্যাচিং ট্রেতে..... কোণে সাজাতে হয়।

৪. শতক প্রতি ..... কেজি চুন প্রয়োগ করে ঘোলাপানি থিতিয়ে স্বাভাবিক করা যায়।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	অজাজ বংশবৃদ্ধি	পানির ক্ষতিকর দিক
২.	পানি নিকাশ	নিরাপদ দূরত্ব
৩.	সেচ প্রকল্প	পি. আই. আর. ডি. পি
৪.	বীজ ফসলের পৃথকীকরণ	মাটিতে 'জো' আনা
		গুটি কলম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কর্তন বা ছেদ কলম কী?

২. ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্য কী?

৩. পুকুরের পানি কেন শোধন করা হয়?

৪. সেটিং ট্রেতে কীভাবে ডিম বসানো হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান সেচ প্রকল্পগুলো কী কী?

২. পানি নিকাশ বলতে কী বোঝ? পানি নিকাশের উদ্দেশ্যসহ অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর দিকগুলো বর্ণনা কর।

৩. বীজ কয় ধাপে উৎপন্ন করা হয়? বিভিন্ন প্রকার বীজের বর্ণনা দাও।

৪. ডিম বাছাইয়ের ধাপসমূহ উল্লেখপূর্বক প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম ফোটানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. কীভাবে সেচের পানির অপচয় হয়ে থাকে? সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কেন?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাচ্চা ফোটানোর জন্য নির্বাচিত ডিম শীতকালে কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে?

ক. ৩–৪ দিন খ. ৪–৫ দিন

গ. ৭–১০ দিন ঘ. ১০–১২ দিন

২. ফোয়ারা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়-

i. বীজতলায়

ii. শাক–সবজির ক্ষেতে

iii. বহুবর্ষজীবী ফল গাছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাজিয়ার বাবা তাঁর ৫ শতকের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে মাছ চাষের উদ্যোগ নেন এবং চাষ শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ রাজিয়া লক্ষ করে যে, পুকুরের পানি ঘন সবুজ রং ধারণ করেছে এবং মাঝে মাঝে মৃত মাছও ভেসে উঠে। ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাজিয়া তার বাবাকে এ সমস্যা সমাধানে পুকুরে তুঁতে বা কপার সালফেট প্রয়োগের পরামর্শ দেয়।

৩. রাজিয়ার বাবার পুকুরের জন্য প্রয়োজনীয় তুঁতে বা কপার সালফেটের পরিমাণ কত?

ক. ১২–১৫ গ্রাম খ. ২৪–৩০ গ্রাম

গ. ৪৮–৬০ গ্রাম ঘ. ৬০–৭৫ গ্রাম

৪. রাজিয়ার বাবার পুকুরে উল্লিখিত সমস্যার কারণ কী?

ক. পুকুরে শেওলার স্তর সৃষ্টি হওয়া খ. পুকুরের পানি ঘোলা হওয়া

গ. পুকুরে অতিরিক্ত চুন দেওয়া ঘ. পুকুরের পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব কম–বেশি হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

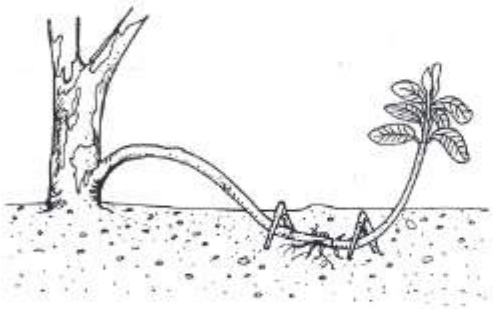

ক

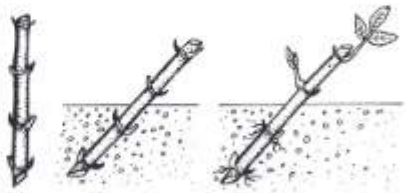

খ

ক. উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবিস্তার বলতে কী বোঝ?

খ. অঙ্গজ বংশবিস্তারের একটি সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. গোলাপের বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে ক ও খ চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতি দুইটির মধ্যে কোনটি কার্যকরী? কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের পদ্ধতিসমূহ ভালো ফলনে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২. শ্যামল বাবু তাঁর পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য বাড়ির পাশের স্বল্প জমিতে টমেটো ও ফুলকপি চাষ শুরু করেন। এ ছাড়া বাড়ির পিছনে তাঁর ৫ বছরের পুরানো আমের একটি বাগানও আছে। শ্যামল বাবু আম বাগানে যে সেচ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে সফলতা লাভ করেন তা তাঁর সবজি ক্ষেতে প্রয়োগ করেন। এতে সবজি বাগানে সমস্যা দেখা দেয়।

ক. পানি সেচ কেন দেওয়া হয়?

খ. সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটি প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর।

গ. শ্যামল বাবু যে সেচ পদ্ধতি প্রয়োগ করে চাষে সফলতা পান তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শ্যামল বাবু কীভাবে সবজি ক্ষেতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবেন বিশ্লেষণ কর।